গ. গীতিকবিতা

গীতিকবিতা কথাটি এসেছে ইংরেজি Lyric poetry থেকে। Lyric শব্দটির মূলে আছে লায়ার নামক একটি বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র, এই যন্ত্রসহযোগে যে গান গাওয়া হতো তাকেই বলা হতো লিরিক বা গীতিকবিতা। এই ভাবে গ্রহণ করলে ইউরোপের বিভিন্ন আখ্যানকাব্য, এমনকী ইলিয়াড ও ওডিসিকেও গীতিকবিতা বলতে হবে, কারণ সেগুলি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গানই করা হতো একদিন। এইভাবে দেখতে গেলে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে লেখা খণ্ডকাব্য ও আখ্যানকাব্যের প্রায় প্রত্যেকটি ধারাকেই গীতিকবিতা বলতে হয়, কারণ এ সবই গান করা হতো। বৈষ্ণব পদাবলী বা শাক্ত পদাবলী ছিল মূলতই গান, সেগুলি এখনও সংগীত হিসাবেই পরিবেষণ করা হয়, কিন্তু বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ-মূলক কাব্য ইত্যাদি সবই তো সুর করে পাঠ করা হতো। সুতরাং সাংগীতিক অনুষঙ্গ থেকে তাদেরও তো বাদ দেওয়া শক্ত।

অথচ গীতিকবিতা বলতে আমরা এখন যে ধরনের কবিতা বুঝি তার সঙ্গে সংগীতের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। এই ব্যাপার কেমন করে ঘটেছে তা বোঝা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা থেকে। বিবিধ প্রবন্ধের 'গীতিকাব্য' নামক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—

"গীতের পরিপাট্যজন্য আবশ্যক দুইটি—স্বরচাতুর্য এবং শব্দচাতুর্য। ...দুইটি ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটে না। যিনি সুকবি, তিনিই সুগায়ক, ইহা অতি বিরল।

কাজে কাজেই একজন গীত রচনা করেন, আর একজন গান করেন। এইরূপ গীত হইতে গীতিকাব্যের পার্থক্য জন্মে। গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক, এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূর রহিল; অগেয় গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল।

অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই ব্যাখ্যা পুরোপুরি গ্রহণ করা সম্ভব নয়, কারণ গীত এবং গীতিকবিতার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। গীতচয়িতার স্বাধীনতা অত্যন্ত সীমিত, সুরারোপের পক্ষে উপযোগিতাই সংগীত রচনার প্রধান লক্ষ্য। ছন্দ গঠনের ব্যাপারে তিনি খানিকটা সুবিধাও লাভ করে থাকেন—সুরবাহিত বলে ছন্দের বিভিন্ন ত্রুটি গানে সংশোধন করে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু খাঁটি গীতিকবিতায় প্রকাশসৌন্দর্যও অত্যন্ত বেশি পরিমাণে দরকার হয়।

অবশ্য গীতিকবিতার আলোচনায় উদ্ধৃত বঙ্কিমচন্দ্রের এই বাক্যটি অত্যন্ত মূল্যবান, 'বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের' পরিস্ফুটন গীতিকবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। সে দিক থেকে দেখতে গেলে মন্ময় কবিতামাত্রই গীতিকবিতা। রবীন্দ্রনাথ কবিতার স্থূল দুটি বিভাগ করতে গিয়ে বলেছিলেন—

Scanned with CamScanner

"কোনো কাব্য বা একলা কবির কথা, কোনো কাব্য বা বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা।" গীতিকবিতা একলা কবির কথা। কবির নিজের কথা বলেই অনুভূতির তীব্রতা এই কবিতার প্রাণ। তীব্র অথচ সংহত অনুভূতি প্রকাশিত হয় ক্ষুদ্র বা অনতিদীর্ঘ পরিসরে। কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি যে-কোন বিষয় আশ্রয় করেই ব্যক্ত হতে পারে, সুতরাং গীতিকবিতার বিষয়ের ব্যাপ্তি অত্যন্ত বেশি। তবে এই সঙ্গেই আমাদের মনে রাখতে হবে, ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস কেবলই ব্যক্তিগত স্বার্থে সীমিত থাকলে তা কবিতার মর্যাদা লাভ করতে পারে না—তার আবেদন অবশ্যই সর্বজনীন হতে হবে।

সেই কারণেই গীতিকবিতার বিষয় ধর্মীয় বা তাত্ত্বিক না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ধর্ম এক বিশেষ সম্প্রদায়ের, অনেক ক্ষেত্রে তত্ত্বও তাই। কাজেই তার দ্বারা ব্যক্তিগত অনুভূতি ঠিক সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত থাকে না।

এবার গীতিকবিতার প্রধান লক্ষণগুলি সূত্রাকার উল্লেখ করতে গেলে আমরা বলতে পারি, প্রথমত, তা কবির একান্ত ব্যক্তিগত কথা; তাঁর এই নিজস্ব উপলব্ধির সঙ্গে সাধারণভাবে ধর্ম বা তত্ত্বদর্শনের বিশেষ কোন সম্পর্ক থাকবে না, এটাই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়ত, কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির তীব্রতার জন্যই এতে এমন এক নিবিড় আত্মময়তা থাকে যা অনুভূতিশীল চিত্তকে প্রবলভাবে স্পর্শ করে। কবি ও পাঠকের এই রসসংযোগেই গীতিকবিতার সৌন্দর্য ফুটে ওঠে।

তৃতীয়ত, কবির অনুভূতি ও উপলব্ধি ব্যক্তিগত হওয়া সত্বেও গীতিকবিতার এক শাশ্বত ও সর্বজনীন আবেদন থাকে—সম্ভবত এই কারণে যে, আন্তরিক অনুভূতির মধ্যে এমন এক নিত্যতা এবং আবেদন আছে যে অনুভূতিশীল সকল মানুষকেই তা আন্দোলিত করতে পারে।

চতুর্থত, আবেগ সংযত ও সংহত হয়ে যখন গাঢ়ত্ব লাভ করে, ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ যে অবস্থাকে বলেন 'Emotions recollected in Tranquillity'—সেই অবস্থাতেই গীতিকবিতা লেখা হয়। সুতরাং এর প্রকাশ হয় সাবলীল, ব্যঞ্জনাময় ও সংহত—নিটোল মুক্তাসম্ভব এক-একটি শুক্তির মত। আকারে সংক্ষিপ্ত অথচ অনুভূতিতে প্রগাঢ়—এটাই গীতি কবিতার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য।

ঘ. গীতিকবিতার উৎস

খাঁটি গীতিকবিতার লক্ষণ একেবারে সাহিত্যের চরম মূল্যে (absolute value) বিচার করলে আধুনিক কালের আগে তার উদ্ভব স্বীকার করা সম্ভব হবে না, কারণ কবির বিশুদ্ধ অহং তখনই ধর্ম ও তত্ত্ব নিরপেক্ষভাবে আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবে যদি আমরা বিচার করি, অন্তত ধর্মীয় উপলক্ষকে ব্যক্তির অহং-আবরক বলে বিবেচনা না করি তাহলে গীতিকবিতাকেই সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন শাখা হিসাবে আমরা স্বীকৃতি জানাতে পারবো। প্রাচীন ও মধ্যযুগের গীতিকবিতার বিচারে ধর্মীয় উপলক্ষকে আমরা ততটা মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না দুটি কারণে, প্রথমত সেই সময়ে ধর্মকে আশ্রয় করাটা ছিল সাহিত্যের পক্ষে একটা অপরিহার্য ব্যাপার। 'The poet is not a mystic'—কথাটি সূক্ষ্ম ও দৃঢ়ভাবে মানতে গেলে ধরে নিতে হয় আদি ও মধ্যযুগে সাহিত্য বলে কিছু ছিলই না; এবং সেটা মেনে নেওয়া আদৌ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, কবি যখন গীতিকবিতার মন্ময়তাকে সত্যিই আয়ত্ত করতে

Scanned with CamScanner

পরেন তখন তিনি যে-দেবদেবীর কথাই বলুন, তাঁর জবানীতে আসলে কিন্তু তিনি নিজের কথাই বলতে থাকেন। অন্যভাবে বলা যায় দেবদেবীর সঙ্গে আত্মস্থতায় তিনি এমন নিমগ্ন হয়ে যান যে এখানে তাঁদের ভিন্নতা প্রায় লুপ্ত হয়।

অবশ্য হাডসন তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, সুপ্রাচীন সাহিত্যে যেসব রচনার সন্ধান বা উল্লেখ আমরা পাই তা ছিল প্রধানত গোষ্ঠীসাহিত্য, একক সাহিত্য নয়। একক সাহিত্য বা ব্যক্তিত্বের বোধ আমাদের এসেছে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের পর। আমরা মনে করি, প্রাচীন যুগে গীতিকবিতা বা মন্ময় কবিতা লেখা সম্ভব, এই ছাড়পত্র দিলে গোষ্ঠীসাহিত্যকেও গীতিকবিতাতেই ব্যক্তিত্বের পরিবর্তে যা পরিস্ফুট হয়েছে তা হল অনুভূতির গভীরতা এবং মানবিক উচ্চারণ। দেবদেবীর বন্দনাকে উপলক্ষ করেও যদি সেই মানবতার সুর আমরা শুনতে পাই এবং তা যদি উঠে আসে অনুভূতির গভীর স্তর থেকে, তাহলে তাকে গীতিকাব্য বলতে আমাদের বাধা থাকা উচিত নয়। এর পরও বলবো, অনুভূতির সেই গহন উষ্ণতা থেকে উঠে আসা পংক্তিগুলি গোষ্ঠীসাহিত্যের উপলক্ষ সত্ত্বেও ব্যক্তিগত না হয়ে পারে না। যেমন বেদ-রচয়িতা আর্যঋষি যখন ঈশ্বরকে জানার অনুভূতিও ব্যক্ত করেন, সে অনুভূতি ব্যক্তিগত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ইহুদী সংগীতে কবি যখন 'আমি' বা 'আমার' বলে উল্লেখ করে কবিতা রচনা করেন, তাতেও কবির ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা ইহুদী জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাই ধ্বনিত হয় বেশি। সেই জন্যই ভারতবর্ষের 'সামগানে' মাঝে মাঝে যে ব্যক্তিগত অনুভূতি আমাদের স্পর্শ করে, 'ওল্ড টেস্টামেণ্টে'র 'বুক অব সাম্‌স্'-এ সেই ব্যক্তিগত অনুভূতির পরিচয় অল্প—যদিও প্রকাশ-সৌন্দর্যে সেগুলি অসাধারণ।

গীতিকবিতার প্রাচীন উৎস সন্ধান করলে আমাদের গ্রীক সাহিত্যেরই শরণাপন্ন হতে হবে। অবশ্য আদি ভারতীয়-আর্য যুগের বৈদিক সাহিত্য কিংবা চীনের প্রাচীন কবিতার কথাও আমাদের মনে পড়বে। চীনের প্রাচীন কবি লি-পোর কবিতা রবীন্দ্রনাথের এত আধুনিক মনে হয়েছিল যে তিনি বেশ কিছু কবিতার অংশবিশেষ অনুবাদ করে আমাদের শুনিয়েছেন 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে। একটি কবিতা এই রকম—

"নগ্ন দেহে শুয়ে আছি বসন্তে সবুজ বনে।
এতই আলস্য সে সাদা পালকের পাখাটা নড়াতে গা লাগছে না।
টুপিটা রেখে দিয়েছি ঐ পাহাড়ের আগায়,
পাইন গাছের ভিতর দিয়ে হাওয়া আসছে
আমার খালি মাথার'পরে।"

প্রাচীন গ্রীক কবিতা যেকোন প্রাচীন সাহিত্যের মতোই ছিল গেয় কবিতা। এক ধরনের গান ছিল সমবেতভাবে গাইবার, তাদের বলা হতো 'কোরিক' অর্থাৎ কোরাস গান ; অন্য ধরনের গানকে বলা হতো 'মোনোডিক' বা একক সংগীত। এর মধ্যে 'কোরিক' আলাদা লেখা হতো না, লেখা হতো নাটকের মধ্যে। তবে এস্কাইলাস এবং সোফোক্লেসের মতো কবিও সমবেত-সংগীত রচনা করেছেন। কিন্তু তুলনামূলকভাবে যে মোনোডিক গান শ্রেষ্ঠতর ছিল সে কথা অনেকেই স্বীকার করেন। প্রাচীন গ্রীক কবি সাফো, এলকেয়াস প্রভৃতি এই রকম একক সংগীতের বড় শিল্পী ছিলেন। অবশ্য এ ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী জানাতে পারেন বোধ হয় কবি পিণ্ডার।

Scanned with CamScanner

গ্রীক কবিতায় লিরিকের এই প্রস্তাবনা লাতিন সাহিত্যে নিয়ে এলেন বাতুল্ল, হোরেস প্রমুখ কবি। এদিকে ইংরেজি সাহিত্যের প্রত্যুষ-পর্বে অর্থাৎ অ্যাংলো-স্যাকশন পর্বেই যে গীতিকবিতার উদ্ভব দেখা গিয়েছিল সে কথা আমরা জানতে পেরেছি। সেই সময় যেমন 'বিউল্‌ফের' মতো মহাকাব্যিক রচনা ছিল, তেমনি ছিল 'এক্সাইটর বুক'. যাতে মানবিক ঐশ্বর্যসম্পন্ন সাতটি খণ্ডকবিতা ছিল। প্রত্যেকটি কবিতাতেই ব্যক্তিগত বিষাদের সুর ফুটেছে, অবশ্য তাতে কবিরা কেউই ভেঙে পড়েননি। যেমন 'ডিওর' কবিতার লেখক যা বলেছেন তার অনুবাদ—

"গিয়াছে চলিয়া সে দুঃখ হায়,
এ ব্যাথাও যেন সেভাবে মিলায়।"

হাল ভেঙে দিশা হারানো এক নাবিকের কণ্ঠস্বর শোনা যায় 'দি সি-ফেয়ারার' কবিতায়, ঊনবিংশ শতকের কবি সুইনবার্ণের কবিতায় যেন সেই কণ্ঠস্বরই ভেসে আসে কালের সমুদ্র পেরিয়ে। মধ্যযুগেই ইংল্যাণ্ড, জার্মানী এবং ফ্রান্সে লিরিক কবিতার সমুন্নতি দেখা যায়। কিছু পরে ইংরেজি সাহিত্যে লিরিক কবিতা আরো ঐশ্বর্যময় হয় সার ফিলিপ সিডনি, এডমণ্ড স্পেন্সার, স্যামুয়েল ডানিয়েল, জন ডান এবং যুগোত্তীর্ণ কবি ও নাট্যকার উইলিয়ম শেক্‌স্‌পীয়রের হাতে।

অবশ্য ধর্মের উষ্ণতায় লালিত হলেও ভারতবর্ষের গীতিকবিতা একেবারে অনুল্লেখ্য ছিল না। বৈদিক সংস্কৃত বা ছান্দস্ ভাষার সময় পেরিয়ে এসে লৌকিক সংস্কৃতের যুগে দেখি ধর্মীয় সাহিত্যের প্রবণতাও কমে এসেছে ; অন্তত লৌকিক সাহিত্য বেশ খানিকটা প্রাধান্য পেয়েছে। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক, কারণ তখন সাহিত্যের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন রাজন্যবর্গ এবং রাজসভায় রচিত সাহিত্য কিছুটা মানবিক এবং দেহসম্পর্কযুক্ত হতে বাধ্য। কালিদাসের দীর্ঘ কাব্যেও লিরিক ধর্মের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, বিশেষত তাঁর পত্রকাব্য 'মেঘদূতে'র দুটি পর্বেই। পরবর্তীকালে রচিত ধোয়ীর 'পবনদূত' কাব্যটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' যদিও রাধাকৃষ্ণের ভাগবত উপাদান নিয়ে রচিত, তা সত্ত্বেও 'বিলাসকলাকুতূহল' মানুষের পক্ষেও যে তা সমান রুচিকর, সে কথা কবি নিজেই বলেছেন।

গীতিকবিতা বলতে যদি সঠিকভাবে ওই বীণাজাতীয় যন্ত্রসংযোগে, বা আরো সাধারণভাবে, গান করবার জন্যই লেখা কবিতা বোঝায়, তবে বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃত তার বিশেষ সন্ধান পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমরা যে অর্থে কবিতাকে গীতিকবিতা বা লিরিক হিসাবে ধরে নিয়েছি সেরকম কবিতা যে সংস্কৃতে অনেক লেখা হয়েছিল তার প্রমাণ দুটি সংস্কৃত প্রকীর্ণ শ্লোকসংগ্রহ—'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' (পরবর্তীকালে পরিবর্তিত নাম 'সুভাষিতরত্নকোষ') এবং 'সদুক্তিকর্ণামৃত'। রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক কবিতার সংখ্যা কিছু বেশি ছিল বটে এই দুটি সংকলনে—অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ-আশ্রিত কবিতা, তবে অন্য বিষয়ে লেখা লিরিকগন্ধী কবিতাও ছিল। যেমন দারিদ্র্যলাঞ্ছিত একটি কবিতা—

"চলৎকাষ্ঠং গলৎকুড্যমুত্তানতৃণসঞ্চয়ম্।
গণ্ডুপদার্থিমণ্ডুকাকীর্ণং জীর্ণং গৃহং মম।।"

Scanned with CamScanner

মূলভাবের অনুবাদ হতে পারে এই রকম ঃ

'খসে গেছে কাঠ, ধ্বসেছে দেয়াল,
জমে জড়ো হল এঘরের চাল,
আকীর্ণ শুধু জীর্ণ গৃহেতে
কেঁচো, আর কিছু ব্যাঙ।'

এই সঙ্গে একটু সম্পন্নতার সুখের কবিতাও মনে করা যাক। কেদারভট্ট নামে এক কবি লিখেছেন—

"তরুণং সর্ষপশাকং নবোদনং পিচ্ছিলানি চ দধীনি।
অল্পব্যয়েন সুন্দরি গ্রাম্যজনো মিষ্টমশ্নাতি।।"

সুন্দরী রমণীকে ভোজনের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, বঙ্গানুবাদের বোধ হয় প্রয়োজন নেই তা, থাকলে ভাবানুবাদ এরকম করা যায় ঃ

'তরুণ সর্ষপশাক, নতুন চালের ভাত,
পিচ্ছিল দধি কিছু—শোন হে সুন্দরী,
সামান্য ব্যয়ে গ্রামে এসব ভোজন করি।'

সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষায় উদ্ভবের মধ্যবর্তী স্তর প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ ভাষাতেও কিছু খাঁটি গীতিকবিতার সন্ধান পাই। এই ভাষার প্রকীর্ণ কবিতার সংকলনও একটি আছে—'প্রাকৃত পৈঙ্গল,' অবশ্য সরহের দোহাকোষেও কিছু উৎকৃষ্ট কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়, তবে তা অধ্যাত্ম সাধনার রহস্যময় কবিতা। 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' সংকলনের অনেক কবিতাই যে মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ ও সাহিত্য গুণসম্পন্ন তাই নয়, তাদের একটু সীমিত অর্থে, সার্থক গীতিকবিতাও বলা যায়। দু-একটি কবিতার দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা বোঝা যাবে। 'প্রাকৃত পৈঙ্গলের' এক কবি লিখেছেন বিরহের এই আশ্চর্য সুন্দর কটি পংক্তি—

"সো মহ কন্তা
দূর দিগন্তা।
পাউস আএ
চেলু দুলাএ।।"

অনুবাদ এই রকম ঃ

'কান্ত এখন দূর প্রবাসে,
মন উচাটন, বর্ষা আসে।' (সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

লক্ষ্য করবার মতো, কবি স্পষ্ট 'মন উচাটন' বলেননি, বলেছেন 'চেলু দুলাএ'—অর্থাৎ শাড়ির আঁচল উড়ছে, তার মানে শাড়ির আঁচলের মতো মনও চঞ্চল হয়ে পড়েছে।

এবার একটি গদ্যরসাত্মক কবিতা স্মরণ করা যাক। আধুনিক রসিক পাঠকের মুখে মুখে এটি প্রায় আধুনিককালের কবিতাই হয়ে গিয়েছে—

"ওগ্‌গর ভত্তা
রম্ভঅ পত্তা।

Scanned with CamScanner

গাইক ঘিত্তা
দুদ্ধ সজুত্তা।
মোইলি মচ্ছা
নালিচ গচ্ছা
দিজ্জই কন্তা
খাই পুনবন্তা।"

অথাৎ কিনা,

'ওগ্‌রানো ভাত কলার পাতে,
গাওয়া ঘি আর দুধের সাথে
মৌরলা মাছ, নালিতা শাক,
দিচ্ছে তো বউ, বর বসে থাক।'

বাংলা ভাষার উদ্ভবের একেবারে প্রথম পর্বে চর্যাপদের মধ্যে গীতিলক্ষণ থাকলেও গীতিকবিতার লক্ষণ তেমন ছিল না, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে বৈষ্ণব পদাবলী এবং আরো পরে শাক্তপদাবলী দেব-দেবীকে অবলম্বন করেও সার্থক গীতিকবিতার আস্বাদ এনে দিয়েছে। আধুনিককালের গীতিকবিতা আমরা প্রথম পাই সম্ভবত বিহারীলাল চক্রবর্তীর লেখায়। অবশ্য হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বা নবীনচন্দ্র সেনের খণ্ড কবিতাতেও নিশ্চয়ই তার যোগ্য পূর্বাভাস ছিল এবং মধুসূদন দত্তের আক্ষেপমূলক চতুর্দশপদী কবিতায় গীতিকবিতার লক্ষণ আরো স্পষ্ট। আধুনিককালের কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ যে গীতিকবিতার ভাণ্ডারকে অফুরন্ত ঐশ্বর্যে পূর্ণ করেছেন সে কথা বলাই বাহুল্য। সেই সঙ্গে আছেন দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, প্রিয়ম্বদা দেবী, কামিনী রায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর মতো কবি এবং রবীন্দ্রোত্তর যুগের প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন প্রভৃতি।

তবে সব কথার শেষে, অর্থাৎ গীতিকবিতার উৎস বিচার শেষ করেও এ কথা আমাদের বলতে হবে যে, শিষ্ট সাহিত্যের সমান্তর ধারায় বাংলা লোকসাহিত্যেও টুকরো কবিতা ও ছড়া প্রচলিত ছিল। আজ সেসবের অনেকটাই লুপ্ত হয়ে গেছে—ছড়া ও ব্রত কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পুরানো গ্রাম্যমহিলার মুখে, মেয়েলি ব্রতকথায়; আখ্যান কিছু বেঁচে আছে রূপকথায়, আর মৈমনসিংহ গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ-গীতিকায়। কিন্তু গীতিকবিতার উদ্ভবে এই সব লোক সাহিত্যের মূল্যও নিতান্ত কম নয়।

Scanned with CamScanner